পরমার্থিক জীবনের উন্নয়নের উপায়

- শান্তনু কুমার ধর

অনেকেই বিশ্বাস করে মানুষের জীবনে ভাগ্য অনেকটা পূর্ব নির্ধারিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে এ বিশ্বাস আরো দৃঢ়। আমার এ লেখার উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে জানা, ভাগ্য ও পরমার্থিক জীবনের উন্নয়ন কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী আলোচনা করা।

আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনের চলার পথটি বেছে নিতে পারলেও, সেই পথে চলতে গিয়ে আমরা কখন কোন ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো তা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আমরা মানুষ হিসেবে জন্ম নেবার আগে বহু যোনী পার করে আসি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এরকম প্রায় ৮৪ লক্ষ যোনী রয়েছে। জাতিস্বর না হলে কারোর পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, আমরা কোন জন্মে কে কি ছিলাম। সংগত কারণেই তা সম্ভব নয়, কারণ আমরা এ জীবনের সব স্মৃতিই মনে রাখতে পারি না। আমাদের এক যোনী থেকে অন্য যোনীতে জন্ম - মৃত্যু যেখানে অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়, সেক্ষেত্রে কি করে আমাদের পক্ষে সেই স্মৃতি কোনভাবে মনে রাখা সম্ভব? খুব কম মানুষ তার পূর্ব জন্মের স্মৃতিকে স্মরণ করতে পারেন। আদিকাল থেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র, সম্মোহন বিদ্যা বা যোগসাধনার মাধ্যমে অনেক লোক পূর্ব জন্মের স্মৃতিকে স্মরণ করার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু সাধারণ কারোর পক্ষেই সব জন্মের কথা স্মরণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই আমাদের সমস্ত জন্মের কর্ম সম্পর্কে অবগত। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে আমাদের সমস্ত জন্মের কর্মের হিসেব নিকেশ রাখা হয় "সঞ্চিত কর্ম" হিসেবে। আমাদের এই সঞ্চিত কর্ম অনুযায়ী আমাদের পরবর্তী জন্মের কর্ম নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যাকে "প্রারব্ধ কর্ম" বলা হয়। তাই প্রারব্ধ কর্মই হচ্ছে আমাদের এ জন্মের জন্য নির্ধারিত ভাগ্য, যার উপর আমাদের কোন ধরণের নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা বর্তমান জন্মে যেসব কর্ম করি সেসব কর্ম অতীত কর্ম, ক্রিয়ামান কর্ম ও আগাম কর্ম হিসেবে পরিচিত। এ ধরণের কর্ম তিন প্রকারে সম্পন্ন হয় – ইচ্ছা

অনুসারে, অনিচ্ছা জনিত, পরের ইচ্ছা অনুযায়ী। তাই ক্রিয়ামান বা আগাম কর্মের উপরই শুধু আমাদের নিয়ন্ত্রণ আছে, তাও যেসব কর্ম শুধু আমাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়।

মানুষের পক্ষেই একমাত্র প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরকে জানা বা আধ্যাত্মিক সাধনা করা সম্ভব। পৃথিবীর অন্যান্য জীবজন্তুর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদিও আমাদের ধর্মে বিভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় – যিনি নিরাকার পরব্রহ্ম বা ওম’ কার রুপে পরিচিত আবার তিনি সাকার রুপে পরমেশ্বর ভগবান নামে পরিচিত। গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তার প্রমাণ হিসেবে ব্রহ্ম সংহিতাতে ব্রহ্মা বলেছেন ,”ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণ,সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহঃ।”

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীদেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময় অর্থাৎ নিত্ত,চিন্ময় বা জ্ঞানময় এবং চিদানন্দময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলা হয়।

ভগবদগীতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের উপর আর কোন সত্য নেই। ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায় অনুসারে বিশ্বরূপ দর্শন দানের মাধ্যমে তিনি তা প্রমান করেছেন। বিশ্বরূপ এবং চতুরবাহু ভগবান বিষ্ণু উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। দেবতাগণ একই ঐশ্বরিক শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের এই বিশ্বরুপ থেকে এর প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায়। দেবতাদের সকলে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। যাকে শক্তির নিত্যতা সূত্রের মত করেও অনেকটা ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে পরমেশ্বর ভগবান বৈকুন্ঠে শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী লক্ষী, কৈলাসে শিব ও পার্বতী, সত্যলোকে ব্রহ্মা ও সরস্বতী প্রমুখ ত্রিদেব-দেবী সহ বিভিন্ন ধামে বিভিন্ন সাকার রুপে বিরাজ করেন। যেমন অযোধ্যা ধামে রাম রুপে। এভাবে তিনি যত অবতার নিয়েছেন সব সাকার রুপের জন্যই নির্দিষ্ট ধাম রয়েছে। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী তিনি ২৪ বার অবতার হিসেবে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান ১০ অবতার সম্পর্কে যেকোন হিন্দুই জানে। ভগবান কপিল, নারদমুনি, হয়গ্রীবা প্রমুখসহ আরো অনেকে ভগবানেরই আংশিক

অবতার। যে যে রুপে তাঁকে প্রাপ্ত হন, সে সেই ধামে যাবার সুযোগ পান। তার প্রধান ধাম গোলক ধাম যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণ রুপে বিরাজ করেন। যেখানে তিনিই একমাত্র পরমপুরূষ হিসেবে বিরাজ করেন। সৃষ্টির বাকী সবকিছু প্রকৃতি। বাস্তবিক পক্ষে পুরুষ ব্যতিত প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই নেই। সমস্ত প্রকৃতিতেই তিনি পূর্ণরুপে বিরাজ করেন, প্রকৃতি শূন্য হলেও প্রকৃতি ব্যতিরেকেও তিঁনি পূর্ণই থাকেন। কারণ পরমেশ্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ, উজ্জ্বল দীপ্তিময় অনন্ত ব্রহ্মজ্যোতি (কোটি সূর্যের হিরন্ময় প্রভা) দিয়ে আচ্ছাদিত তাঁর সূক্ষ্ম সচ্চিদানন্দময় রূপ শরীর দিব্য দৃষ্টি দিয়েও দেখা সম্ভব নয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান নিজে কৃপা না করলে কেউ তাঁকে জানতে বা দেখতে পারেন না। যে উনাকে তাঁর প্রকৃত স্বরুপে জানতে বা দেখতে পারেন সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে, যা অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার (৭/৩) শ্লোক অনুসারে, “মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে । যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ।।” অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয়ত একজন আমার স্বরুপ জানার চেষ্টা করে। আবার, তাঁহাদিগেরও সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন।

কেন ও অন্যান্য উপনিষদ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছে সর্বকারণের কারণ। উনিই আমাদের চোখকে দেখান, উনি আমাদের কানকে শোনান, উনিই আমাদের নাককে ঘ্রাণ নিতে সাহায্য করেন। তাছাড়া আমাদের ইন্দ্রিয় গুলির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। তাই পরমেশ্বর ভগবান কখনই ইন্দ্রিয়(কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন ধরণের ইন্দ্রিয়েরই) গ্রাহ্য নন। কেউ তাঁকে দেখতে পান না, শুনতে পারেন না, এমনকি তাঁর উপস্থিতিও কেউ টের পান না। সে জন্যই মূর্খ-কুপমন্ডূকরা তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করেন। উদাহরণস্বরুপ তাপকে আমরা দেখতে পাইনা, অথচ অনুভব করি। বিশ্বজগতে এমন অনেক কিছুই আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, তাই বলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরকে শুধু মনের বিশ্বাস দিয়েই অন্তরে ও বাইরে অনুভব করা যায়। তিনি মনের চেয়েও দ্রুতগামী, শক্তিশালী দেবতারাও তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন না। তিনি যেমন অতি নিকটে আবার তিনিই সব

চাইতে দুরে অবস্থান করছেন, যেখানে কোন দেবতা, মানুষ বা জীব সহজে পৌছতে পারেন না। ঈশ্বরকে নিরাকার ও নির্গুণ, সাকার ও সগুণ - উভয় ভাবেই উপাসনা করতে হয়। নয়তো কেউই উনাকে প্রকৃত ভাবে জানতে পারে না। উপনিষদীয় ব্রহ্মবিদ্যা থেকে আমরা পরমেশ্বর সম্পর্কে এমন ধারণাই পাই।

অনেকে জানতে চান দেবতাদের পূজা শাস্ত্রে স্বীকৃত কিনা? দেবতাদের পূজা করলে তাঁরা খুশি হয়ে ভক্তদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। দেবতাদের পূজা কেউ না করলেও তারা যার দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। সেজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে এক আঙ্গুলে সাত দিন ধারণ করে দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের প্রকোপ থেকে সবাইকে রক্ষা করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। তাই যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন তাঁর আর অন্য কোন দেবতার পূজা করতে হয়না। কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়(১৮/৬০) বলেছেন, “সর্বধর্মান পরিতাজ্য মাম একম্ শরণম্ ব্রজ। অহম ত্বাম সর্ব পাপেভ্য: মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ:। । “

অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।”

আমরাও পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বরিক শক্তিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে জীবাত্মা রুপে বিরাজ করেন আর তিনি পরমাত্মারুপে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, পৃথিবীর প্রতিটি জীবের অন্তরেই আত্মারুপে বিরাজ করেন। এমনকি আমাদের শরীরে বাস করা অন্তঃপরজীবি থেকে শুরু করে এক কোষী জীব এমিবার মধ্যেও জীবাত্মা রুপে ঈশ্বরের অংশ বিদ্যমান। আর তাই ঈশ্বর অন্তর্যামী, প্রতিটি জীবের অন্তরকে জানেন। আমরা কোন কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকাতে পারিনা। ঈশ্বর সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যে(থেকেও না থাকার মত করে) সর্বব্যাপী হয়ে আছেন পরব্রহ্ম রুপে। যেমনঃ নৃসিংহ অবতার বেরিয়ে এসেছিলেন একটা পাথরের স্তম্ভ থেকে। আমরা যখন ঈশ্বরের বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণ করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করি তখন আমাদের বুঝতে হবে, ঈশ্বর

শুধু এ মূর্তিতেই সীমাবদ্ধ নন। এই বিশ্বপরিমন্ডলের সমস্ত কিছুতেই তিনি পূর্ণ অব্যয় রূপে ব্যপ্ত রয়েছেন। সবকিছুই তার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তিনি কোন কিছুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন।
শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন, "পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ । জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ।। "
অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বীদগের তপঃস্বরূপ। তাই ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান ভেবে ঈশ্বরের চরণকমলে নিজেকে সমর্পণ করে ঈশ্বরের উপাসনা করলেই পারমার্থিক সুখ লাভ করা যায়।

সংসার জগতে দুই ধরণের ভক্ত হয় অন্তঃর্মুখী আর বহির্মুখী। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এ চার প্রকার পুণ্যাত্মাগণই ঈশ্বরের ভজনা করে থাকে। এদের মধ্যে শুধু জ্ঞানী ভক্তরা অন্তঃমুখি ভক্ত হয়। একজন বহির্মুখী ভক্ত ঈশ্বরের বিগ্রহ দিয়ে ঈশ্বরের পূজা করেন, কিন্তু একজন অন্তঃর্মুখী ভক্ত ঈশ্বরকে নিজের অন্তরে অনুধাবন করেন আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে। যেহেতু তিনি নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে আত্মারূপে খুঁজে পান তাই তার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক হয় আরো বেশি ঘনিষ্ঠ।

আমাদের জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ হলেও অসম্পূর্ন। কেবলমাত্র পরমাত্মার সান্নিধ্য পেলেই জীবাত্মা সম্পূর্ণ হতে পারে। কারণ পরমাত্মাই শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ। যখন আমরা পরমাত্মার সাথে একাত্ম হতে পারি, তখনি আমরা পরমগতি বা মুক্তি লাভ করি। মুক্তিকা উপনিষদ অনুযায়ী সালোক্য, সমীপ্য, সরুপ্য ও সয়ুজ্য এই চার প্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কৈবল্য নামেও এক প্রকার বিশেষ ধরণের মুক্তির কথা কোন কোন শাস্ত্রে আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে আত্মার আকার বড়জোর একটি চুলের অগ্রভাগের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ। তাই আত্মা যেকোন শরীরকে (যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন) ধারণ করতে পারে। এজন্যই একই আত্মা আমাদের শিশু অবস্থা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত শরীরের যত বিবর্তণই ঘটুক না কেন তার সাথে মানিয়ে নিতে পারে। আমাদের দেহাবসানে আত্মা আমাদের শরীর ত্যাগ করে নতুন

শরীরের অপেক্ষায় থাকে। আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমাদের আত্মা এই সময়টুকু ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্তরে গমন করে। অথর্ববেদ, বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীমদ ভাগবত, পদ্ম পুরাণ এবং বায়ু পুরাণ অনুসারে আমাদের এই ব্রহ্মান্ডে এমন ১৪ টি স্তর আছে যেগুলি "লোক" হিসেবে পরিচিত, যাদের অর্ধেক স্তরে স্বর্গীয় সুখ সুবিধা রয়েছে আর বাকী অর্ধেক স্তরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। স্বর্গীয় সুখ সুবিধা যেসব স্তরে রয়েছে সে স্তর গুলি সবার উপরে থাকে বলে, উদ্ধগতির লোক হিসেবেও পরিচিত। এগুলি হচ্ছে, যথাক্রমেঃ ১।সত্য, ২। তপ, ৩। জন, ৪। মহা, ৫। স্বর্গ, ৬। ভুবর, ৭। ভূ লোক। অন্তরিক্ষে সুর্য ও অন্যান্য অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি ভুবর-লোকে অবস্থিত। পৃথিবী ভূ-লোকের অন্তর্গত, পৃথিবীর সমান্তরালে পৃথিবীর মত জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে এমন অনেক গ্রহই রয়েছে। বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম থিওরিও আমাদের অনেকটা একই রকমের ধারণা দেয়। নরক লোকগুলি পৃথিবী লোকের থেকে নিচে অবস্থিত বলে এসব লোকে গমন করলে বলা হয় অধঃগতি। এই লোক গুলিতে কোনদিন সূর্যের আলো পৌছে না বলে এ লোক গুলিকে অন্ধকার লোকও বলে। এই লোক গুলি হচ্ছেঃ অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এই নরক লোক গুলির মধ্যে ৫৫ কোটি গ্রহ রয়েছে। তাদের মধ্যে যমলোকও অবস্থিত। গরুড় পুরান, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি অনুযায়ী ২৮ ধরণের যমলোক রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়। এখানে শুধু নামগুলি উল্লেখ করছি - ১। তমিশ্র , ২। অন্ধতমিশ্র, ৩। রৌরব, ৪। মহারৌরব, ৫। কুম্ভিপাক, ৬। কালসূত্র, ৭। অসিপত্রম, ৮। শূকরমুখম, ৯। অন্ধকূপ, ১০। কৃমিভক্ষণ , ১১। সন্দংশন্ , ১২। তপ্তমূর্তি , ১৩।বজ্রকন্টক সলমলি, ১৪। বৈতরণী, ১৫। পুয়োদকম, ১৬। প্রাণরোধা, ১৭। বিসাশনা, ১৮। লালাভক্ষম, ১৯। সারমেয়দানা , ২০। অভিশ্চি, ২১। অয়হপান , ২২। ক্ষারকর্দমা, ২৩। রাক্ষস ভোজনা , ২৪। শূলপ্রথাম্ , ২৫। দন্ডসুক, ২৬। অবাত-নিরোধনা , ২৭। পরয়াবর্তন, ২৮। সূচিমুখা

যেসব জীব অসুরি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন মহাপাপ করে তারা অধঃগতি প্রাপ্ত হয়ে কোন না কোন যমলোকে শাস্তি পায়। নরকের জীবজন্তু ও কীট হিসেবে জন্ম লাভ করে। যারা শুধু জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখে নিজেকে মগ্ন রাখে কিংবা সংসারের মোহ-মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তারা জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পায় না। তাদেরকে পৃথিবী ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন রকমের জীবের বিভিন্ন যোনী প্রাপ্ত হয়ে জন্ম নিতে হয়। সবকিছু থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, মানব জীবন লাভ করা কতটা দুরূহ। অথচ এই মানব জীবনকে আমরা কিভাবে না নষ্ট করছি? আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি পশু এবং মানুষের মাঝে সম - ভাবে বিদ্যমান। কোন মানুষের জীবন যদি এসবের মধ্যেই অতিবাহিত হয়, তবে তার জীবন আর একটা পশুর জীবনে কোন বিশেষ পার্থক্য থাকেনা।

প্রতিটি জন্মে আমরা বিভিন্ন জীবাত্মার সাথে সম্পর্ক গড়ে ফেলি, যাকে বলা হয় ঋণানুবন্ধন। জ্যোতিষ বিদ্যা অনুযায়ী এ জন্মে যারাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা শত্রু হিসেবে জন্ম নিয়েছে তাদের সাথে আমাদের কোন না কোন জন্মের ঋণানুবন্ধন রয়েছে। তাছাড়া আমরা যখন আসক্তি নিয়ে কোন কর্মে লিপ্ত হই তখন এসব কর্মকে সকাম কর্ম বলা হয়। প্রতিদিন হিসেব করলে দেখা যাবে আমরা যতগুলি কাজ করছি তার বেশিরভাগ কর্মই কিছু পাবার আশায়। অথচ যা আমাদের কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। আমরা জীবনে জ্ঞানে ও অজ্ঞানে খুব বেশি পাপ না করলেও ঋণানুবন্ধন আর কর্ম বন্ধনের জন্যও আমাদের বার বার পৃথিবীতে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিতে হয়। মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিলেই যে আমরা সব সময় সুখকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে পারবো এমন নয়। কত শিশু ভ্রুণাবস্থায়ই হত্যার শিকার হয়, কত শিশুকে জন্মের পরপরই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, কত শিশু বিকলাংগ হয়ে জন্মায়। তাদের জীবনের শুরুই যেখানে কষ্টের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী জন্মের সময় আপনার সাথেও যে ঠিক এমন ঘটবে না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? না নেই। কারণ মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও আপনাকে দুঃখ-ব্যথা-রোগ-শোক-অসম্মান থেকে শুরু করে ত্রিতাপ জনিত দুঃখ ভোগ করতে হবেই। এই ত্রিতাপ জনিত দুঃখ গুলি হচ্ছেঃ ১।

আধ্যাত্মিক — শারীরিক ও মানসিক যাতনা বা ব্যধি, ২। আধিদৈবিক — দৈব প্রকোপ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় , ৩। আধিভৌতিক — জীবজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

অনেকের দুঃখ বা হতাশা যখন সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তারা আত্মহননের পথ বেঁছে নেন। লোকে যদিও জানে এই প্রবাদটি – "আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে বসতি" । ধূমপান করার সময় যেমন-ধূমপায়ী স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জেনেও ধূমপান বন্ধ করেন না। তেমনি আত্মহত্যা করলে যে আরো নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সেটা অনেকে অগ্রাহ্য করেন। মনে করেন এ পৃথিবীর ত্রিতাপ জনিত দুঃখ যন্ত্রণা থেকে তো মুক্তি মিলবে। পৃথিবীর নরক যন্ত্রণা যে ব্যক্তি সহ্য করতে পারছেনা সে নরকের যন্ত্রণা কিভাবে সহ্য করতে পারবে, সেখান থেকে তো সহজে মুক্তিও নেই। অপমৃত্যুর সাথে সাথে যমদূত তার আত্মার সূক্ষ্ম শরীরকে অঙ্গুষ্ঠামাত্র (এক আঙ্গুলের সমান) পরিমান এক যাতনারুপী শরীর দিয়ে আচ্ছাদিত করে ফেলে, যা প্রেত হিসেবে পরিচিত। যেহেতু ত্রিভুবনের(অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) কে কোন লোক বা স্তরে গমন করবে তা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করা হয় না, তাই তাকে পৃথিবীর মধ্যেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে থাকতে হয়। যাতনারুপী শরীর নিয়েই সব কষ্ট সইতে হয়। সে ইর্ষান্বিত হয়ে অন্যের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা। বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধ ব্যক্তিরা তাদেরকে কালো জাদু বিদ্যার জন্য ব্যবহার করে। নির্ধারিত সময় পার হলে তাদের অসুর লোকে গমন হয়। তাই ঈশোপনিষদের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, "অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ।।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেনা, আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, সে মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা হয়ে অজ্ঞানতা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসুর লোক হিসেবে পরিচিত নরকে প্রবেশ করে।

আমার উদ্দেশ্য কোনরুপ ভীতি সঞ্চার করা নয়। কথা হচ্ছে, পৃথিবী যেহেতু স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি, তাই এই পৃথিবীতে আমাদেরকে স্বর্গ ও নরক উভয়ের

অনুভূতিই লাভ করতে হয়। পৃথিবীর কোন জীবই ত্রিতাপ জনিত দুঃখ থেকে অব্যাহতি পায়না। কেউই বলতে পারবে না যে তার জীবনে সব ধরণের সুখ সমৃদ্ধি আছে। কবি হয়তো এ অনুভুতি থেকেই বলেছিলেন যে, "কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর? মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর।

শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা ১৬ তম অধ্যায়ের নাম "দেবাসুর সংগ্রাম যোগ" । সেখানেও বর্ণিত হয়েছে মানুষের মনের মধ্যে সর্বদা এক রকম দেবাসুর সংগ্রাম, তথা 'সু' আর 'কু' প্রবৃত্তির সংঘর্ষ চলতে থাকে। যার অর্থ হচ্ছে মানুষের মধ্যেই দৈব ও অসুরিক উভয় প্রবৃত্তি রয়েছে। ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠ গুণ - সত্ব গুণকে দৈব প্রবৃত্তি বলে, ত্রিগুণের মধ্যে নিকৃষ্ট তমোগুণকে বলে অসুরিক প্রবৃত্তি। রজগুণ হচ্ছে সত্ব ও তমোগুনের মাঝামাঝি, তাই দেবতা ও অসুর সবার মধ্যেই এই গুণ থাকতে পারে। রজ আর তমগুণ জীবকে কামনা-বাসনা পরায়ণ করে তোলে, যা তাঁর আধ্যাত্মিক বিকাশ বা পারমার্থিক জীবনের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আমিষাহার, মাদকগ্রহণ, ইন্দ্রিয় অসংযত রাখা বা ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন থাকার ফলে মানুষের মধ্যে এসব প্রবৃত্তি বেশি বৃদ্ধি পায়। পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডালকে উদ্ভিজ হওয়া সত্ত্বেও এই কারণে রজ-তমোগুণ সম্পন্ন আহার হিসেবে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা বর্জন করেন। তবে কারোর মধ্যে 'সত্ব-রজ-তমো' এ ত্রিগুণের মধ্যে যে গুণই থাকুক না কেন, তাদের কাম, ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি থাকতেই পারে। একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই ত্রিগুণাতীত, বাকি সবার মধ্যেই কোন না কোন গুণ প্রবল থাকে। কঠোর তপস্যারত বিশ্বামিত্রের মত মুনি ঋষিরাও কাম, ক্রোধ ও মোহ তাড়িত হয়ে বিভিন্ন সময় সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু মনের ভেতরের আসুরিক প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে হলে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন। আমাদেরকে সেই জন্য নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। বিজ্ঞান যতই উৎকর্ষ স্বাধন করুক না কেন, আমরা যদি ঈশ্বর সাধনা ও ঈশ্বরকে জানার কোন চেষ্টা না করি তবে আমাদের জীবনের সব কিছুই ব্যর্থ। আর সব জীবের মতই হবে আমাদের জীবন। সাধারণ জীব ভগবানের সাথে

তার সম্পর্কের কথা বিস্মৃত থাকে, তাকে বলা হয় অপোহনম বা বিস্মৃতি। কিন্তু মনুষ্য জীবনে চেতনা অত্যন্ত বিকশিত। তাই এই চেতনা শক্তি কাজে লাগানোর মাধ্যমে ভগবদ ধামে ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বরের প্রকৃতিকে সৃষ্টির মুল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতিটি জীবাত্মা যেন প্রকৃতির মধ্যে থেকে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঈশ্বরের শক্তি বিভুতিকে জানতে পারে। যেখান থেকে একটি আত্মার যাত্রা শুরু সেখানেই আত্মাকে আবার পৌছতে হবে। আত্মাকে ভগবানের অংশ হিসেবে পুরুষও বলা হয়। পুরুষ আর প্রকৃতি মিলে হচ্ছে আমাদের জীবন। প্রকৃতির পঞ্চভূতে আমাদের শরীরের গঠন। যে শরীর ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃতির প্রভাবে মোহিত হয়ে আমরা শুধু আমাদের শরীরকে নিয়ে মত্ত থাকি। কিন্তু আমাদের শরীরে থাকা অব্যয় পুরুষ আত্মাকে জানার চেষ্টা করিনা। এমনকি আমাদের অজ্ঞানতা যখন চরমসীমায় পৌছে আমরা তখন আত্মার উপস্থিতিকে অবিশ্বাস করতে থাকি। অথচ আমরা যখন আত্মার উৎসকে জানতে পারবো তখনি কেবল আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারবো। আমাদের ইন্দ্রিয় অসংযত তাই তার সেই ধৈর্য থাকেনা। ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনি নিজেই ব্যাথিত হন আমাদের দুঃখ দূর্দশা দেখে। তাই তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন রুপে জগতে অবতীর্ন হয়েছেন মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য। অথচ আমরা আমাদের অন্তরের দৈন্যতার জন্য দুঃখ দুর্দশায় ভুগি। ঈশ্বর পক্ষপাতি নন। যে যে ধর্ম মত পথই অবলম্বন করুক না কেন ঈশ্বরের কৃপা সে অবশ্যই পাবে। শ্রীভগবান গীতায় বলছেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।”
অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে সেইভাবে সাড়া দেই।

ঈশ্বর চান যেভাবেই হোক তার ভক্তগণ তাকে যেন জানতে পারেন। তার কাছে ফিরে আসেন। একমাত্র জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হলেই ঈশ্বরের কাছে ফেরা সম্ভব। যে যত কর্ম বন্ধনে জড়াবে প্রকৃতিও তাকে তত কষ্ট দেবে। ঈশ্বরের সাধনা মানে এই নয় যে, সবাইকে সংসার ছেড়ে দিতে হবে। আমরা গাহর্স্থ্য আশ্রমে থেকেও ঈশ্বর সাধনা করতে পারি একজন কর্মযোগী হয়ে। কোন কর্মের জন্য ফল

আশা না করে। সব কর্মকে ঈশ্বরের কর্ম বা কর্তব্য কর্ম হিসেবে পালন করে। এভাবে আমরা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবদ গীতায় বলেছেন,

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ।।

অর্থাৎ কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কর্মফল তোমার হাতে নেই। তুমি যেমন ইচ্ছা কর্ম করতে পার, কিন্তু তার ফল প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কর্মের প্রতিফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।

যেসব কর্ম ঈশ্বরকে সমর্পণ করে করা যায়না সেসব কর্মের ফল কি ভয়ানক হতে পারে আমরা হয়তো অনুধাবন করতেও পারবোনা। কারণ সেসব কর্ম আমাদের কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করে, কর্মের ফল ভোগ করতে আমাদের বার বার জন্ম নিতে হয় আর আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। যেমনঃ গান্ধারী পূর্ব জন্মে শিশু অবস্থায় খেলার ছলে ১০০ টি ফড়িং মেরেছিলো। যার কারণে পরবর্তী জন্মে তাকেও শত সন্তানের মৃত্যুর শোক পেতে হয়েছিল। কর্মফল থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে নিরাসক্ত হয়ে শুধু ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করা। শ্রীমদ্ভাগদ গীতার মতই অন্যান্য উপ নিষদেও এ ধরণের কথাই বলা হয়েছে। যেমন, ঈশোপনিষদের ২য় শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতো অস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

অর্থাৎ যেকোন ব্যক্তি শত বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন যদি তিনি শাস্ত্রবিহীত কর্ম করতে থাকেন। সমস্ত বিষয়ে আসক্তি শূন্য হয়ে কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করলে, সে কর্ম কাউকেই কোন কর্মবন্ধনে লিপ্ত করে না। এভাবে কর্ম করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই । নিস্কাম ভাবে বা আসক্তি মুক্ত হয়ে কর্ম করলে ভগবদ্ভক্তির পথ সুগম হয়ে যায়। আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হলে প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে নিতে হয়। ঈন্দ্রিয়গুলিকে সযংত করা সহজসাধ্য নয়।

যদি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের যেকোন কর্মের পাশাপাশি আমরা ইশ্বর সাধনা চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের ধর্মে ইশ্বর সাধনার যে সহজ উপায় গুলি রয়েছে তা হচ্ছেঃ নিত্যকর্ম পালন, নিয়মিত

শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা-উপনিষদ অনুশীলন, মন্ত্র জপ, একাদশী ও অন্যান্য ব্রতাদি পালন। যে কেউ “হরে কৃষ্ণ” মহামন্ত্র বা অন্য কোন দিব্যমন্ত্র নিরন্তর পাঠ করে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারেন। নিয়মিত মন্ত্রপাঠ আমাদের মোক্ষের অনুগামি করে। আপনাদের মানসিক শান্তি ও পরমার্থিক জীবনের উন্নতির জন্য অন্য একটি মহামন্ত্র উল্লেখ করলামঃ “রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে। রাধে মাধব রাধে মাধব মাধব মাধব রাধে রাধে।।“ মন্ত্র হচ্ছে মনের ত্রাতা বা মানসিক শান্তি দাতা। আর মহামন্ত্র হচ্ছে সবচাইতে বেশি মানসিক শান্তি দিতে পারে যে মন্ত্র। ভগবানের দিব্য নাম ভগবানের স্বরুপ। তাই মন্ত্রপাঠের সময় ভগবানের চরণ হৃদয়ে চিন্তণ করতে হয়। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তণের কোন বিকল্প নেই, ভাগবত পুরাণে বলা আছে, “হরের নাম হরের নাম হরে নাম কেবলম, কলেউ নাস্তেব নাস্তেব না এব গতিহ অন্যথা।”

আসল কথা হচ্ছে আমরা ভগবানের শরণ নিলেই কেবল এই ভবসাগর পার করে জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো। নিরন্তর সাধনা না করলে আমাদের এই জন্মে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়, নইলে আমরা নিশ্চয়ই এ জন্মের আগেই মুক্তি পেয়ে যেতাম। যে যতটুকুই ঈশ্বরের সাধনা করুক না কেন? তার ফল সে তার ভবিষ্যত জীবনে পাবেই। আমরা এই জন্মে যতটুকু সাধনা করবো পরজন্মেও সেই ধাপ থেকে আমাদের সাধনা শুরু হবে। এভাবে একটি আত্মা ধাপে ধাপে মুক্তির দিকে ধাবিত হতেই থাকে। কিন্তু অজ্ঞান ব্যাক্তি বিশেষ করে আত্মার অস্তিত্বে যারা বিশ্বাসী নয় তারা অধঃপাতে যেতেই থাকে। তার জীবন বারবার অধঃপতিত জন্ম কর্ম বন্ধনেই আটকে থাকে। আমাদের যেহেতু পূর্ব জন্মের কর্ম বা অতীত কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, আমরা কেবল আমাদের পাপ পুর্ণ্যের হিসেবের খাতা থেকে পাপের সংখ্যা কমিয়ে সঞ্চিত পুর্ণ্য কর্ম বাড়িয়ে নিতে পারি। যা আমাদেরকে যেমন একদিকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে, তেমনি এই পৃথিবীতে জন্ম নিলে প্রত্যেক বার আমাদের মনুষ্য যোনিতে এমন পরিস্থিতি, পরিবেশ, সমাজ আর পরিবারে জন্ম দিবে যাতে আমরা আমাদের সাধনা চালিয়েই যেতে পারি। প্রকৃতি, গ্রহ-নক্ষত্র (বিশেষ করে নবগ্রহ) এসব নিয়ন্ত্রণ করে।

একজন ব্যাক্তি যখন নিত্য কর্ম, পূজা অর্চনা, শাস্ত্র অনুশীলন বা মন্ত্র জপাদি করতে থাকে তখন তার জন্মছক উন্নত হতে থাকে। তার পীড়া কমতে থাকে।

মানুষ অনেক সময়ই ইন্দ্রিয় সুখ আর কামনা-বাসনার জন্য মানসিক পীড়ায় ভুগে। গীতা অনুসারে মানুষের কর্তব্য তার মনের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনোই উচিত নয়। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে। যিনি তার মনকে জয় করেছেন মন তার পরম বন্ধু কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম, তার মনই তার পরম শত্রু। পুজা আর ব্রতাদি মানুষের অজ্ঞানতাকে দুর করে যখন জ্ঞান আর ভক্তিকে জাগ্রত করে মানুষ তখন নিজেই লজ্জা পায় তার কৃত কর্মের জন্য। আমরা প্রকৃতির প্রভাবেই ইন্দ্রিয় দ্বারা আসক্ত হয়ে নানা হতাশায় ভুগি। আমাদের উচিত সন্ধান করা কিভাবে আমাদের এই অজ্ঞানতাকে দূর করতে পারি।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিং চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ।।

অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডের পার্থিব ও অপার্থিব যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে। তাই ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে বৈরাগ্য অর্জন করে চিত্তকে সংযত এবং আত্মাকে তৃপ্ত রাখতে হবে, যেন অপরের ধনসম্পদ বা প্রতিপত্তি দেখে পরশ্রীকাতর হয়ে কোন ধরণের লিপ্সা কিংবা আত্মসাৎ করার চেষ্টা না করি।

গীতার সারাংশ থেকেও আমরা তো এই শিক্ষাই পাই, যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে, যা হবে তা ও ভালোই হবে। তোমার কি হারিয়েছে যে তুমি কাঁদছো? তুমি যা নিয়েছো তা এখান থেকেই নিয়েছো, যা দিয়েছো তা এখানেই দিয়েছো, আজ তোমার যা আছে কাল তা অন্য কারো ছিলো, পরশু তা অন্য কারো হবে, পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম।

আমরা অনেকেই অনেক কিছুই জানি, কিন্তু কোনদিন পরমার্থিক জীবন নিয়ে

ভাবিনা। আমার লেখাটি পড়ে যদি
আপনার মনে নতুন করে ভাবনা জাগে
তবে আমার প্রয়াস সার্থক হবে। এ
লেখাতে স্বল্প সময় আর স্বল্প পরিসরে
হয়তো যথার্থ ভাবে সবকিছু তুলে ধরতে
পারিনি, সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।